(ঘ) ব্রিটিশ [illegible] পরিস্থিতিতে, স্বাধীনোত্তর উন্নয়নমূলক ভারতীয় প্রেক্ষাপটে জাতিগত অবস্থানের অবনমন ঘটেছে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক ভারতীয় রাজনীতিতে জাতিগত ধ্যানধারণার অনুপ্রবেশ যে অত্যন্ত বাস্তব ঘটনা তা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

মীমাংসা সূত্রে বলা যায় যে, ভারতবর্ষের সংস্কৃতিবান, শিক্ষিত ও প্রগতিশীল গোষ্ঠী সর্বদা জাতিপ্রথার অবসানে সচেষ্ট। তবুও ভারতবর্ষে এর পূর্ণাঙ্গ অবসান চাইলেই করা যাবে না। কেননা সমাজের এক গভীর অন্তঃস্থলে এর উপস্থিতি অত্যন্ত সক্রিয়। তবুও বলা যায় ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। তবে পুরোপুরি অবলুপ্ত হয়নি। বরং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে জাতিগুলি আজও অবস্থান করে চলেছে।

প্রশ্ন ১২। বর্ণ এবং জাতির সংজ্ঞা দাও। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিচার কর।

উত্তর। ভারতীয় জাতিভেদ প্রথাকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা হয়। জাতিভিত্তিক এই স্তরবিন্যাস মূলত চতুর্বর্ণ ভিত্তিক। শাস্ত্রমতে কেউ কেউ মনে করেন বর্ণ থেকেই জাতির উৎপত্তি হয়েছে। বিভিন্ন প্রাচীন শাস্ত্রে জাতি কথাটির পরিবর্তে বর্ণ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ঋগ্বেদের পুরুষসুক্তের ভাষ্যেও বর্ণ কথাটি আলোচিত হয়েছে। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে, ভারতীয় হিন্দু সমাজ চতুর্বর্ণ ভিত্তিক। এই চারটি বর্ণ হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। ভাষ্য অনুসারে প্রজাপতি ব্রহ্মাই চতুর্বর্ণের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু বা জানু থেকে বৈশ্য এবং পদযুগল থেকে শূদ্র। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে চতুর্বর্ণের মর্যাদাগত স্থানও পৃথক। সৃষ্টিকর্তার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয়েছে। তাই ব্রাহ্মণের আসন সমাজে শ্রেষ্ঠ। অন্যদিকে শূদ্রের সৃষ্টি হয়েছে পদযুগল থেকে তাই তাদের স্থান সমাজের নীচু স্তরে। এইদিক থেকে চতুর্বর্ণের কর্মের স্থানও স্বতন্ত্র ছিল। যেমন, ব্রাহ্মণ—পূজার্চনা ও বিদ্যাচর্চায়, ক্ষত্রিয়—শাসক ও যোদ্ধা, বৈশ্য—ব্যবসা, কৃষি, গোপালন এবং শূদ্র—উপরের তিন বর্ণের সেবাদান প্রভৃতি স্বতন্ত্র কাজে বর্ণগুলি অবস্থান করত।

তবে হিন্দু সমাজে বর্ণের পরিবর্তন অসম্ভব ছিল না। ব্যক্তিমানুষের চরিত্র এবং কর্মগত গুণমানের ভিত্তিতে বর্ণের পরিবর্তন সম্ভব ছিল। গীতার ভাষ্য মতে, ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচারী হলে সমাজের নিম্নস্তরে পতিত হত। আবার দাসীপুত্র নিজগুণে দ্বিজত্ব লাভ করতে পারত। তাছাড়া বর্ণের ব্যুৎপত্তিগত অর্থেও বর্ণে পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে। বর্ণের উৎপত্তি 'বৃ' ধাতু থেকে। 'বৃ' অর্থে বোঝায় বরণ বা নির্বাচন করা। অর্থাৎ 'বর্ণ' হল বৃত্তিমূলক ও গুণবাচক। ফলে কর্ম এবং প্রকৃতিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্ণের পরিবর্তন সম্ভব হত। অধ্যাপক বটোমোরও এরূপ মনে করেন যে, বর্ণ ব্যবস্থার প্রকৃতি অনুসারে কোন বর্ণই বদ্ধগোষ্ঠী হিসাবে পুরোপুরি বিবেচিত হত না। তবে অধ্যাপক এন. কে. দত্ত মনে করেন, বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বংশানুক্রমিকতাকে

হিন্দুশাস্ত্রে স্বীকার করা হয়। তাই এরূপ মনে করা হয় যে, ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মণেরই গুণসম্পন্ন হবে। তাই পেশাগত দিক থেকে একটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে। অন্য বর্ণের সদস্যরাও তাদের পেশাগত একটা ধারাবাহিকতা গড়ে তুলবে। এইভাবে বর্ণভেদ ক্রমশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মভিত্তিক রূপ লাভ করে।

কোন কোন সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন, বর্ণ ব্যবস্থার রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত রূপ হল জাতি ব্যবস্থা। যদিও জাতির উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক স্বতন্ত্র মতামত প্রদর্শন করেছেন। অধ্যাপক এস. সি. দ্যুবের মতে, সামাজিক স্তরবিন্যাসে বিভিন্ন জাতির অবস্থান নির্দেশক মাপকাঠি হল বর্ণ। এক একটি বর্ণের স্তরে একই মর্যাদাসম্পন্ন একাধিক জাতির অবস্থান নির্দিষ্ট হয়। আবার অনেকে এরূপ মনে করেন যে, বর্ণ চতুষ্টয়ের সাহায্যে বিভিন্ন বৃত্তিধারী তিন সহস্রাধিক জাতিকে বোঝা সম্ভব নয়। তাই বর্ণের সাহায্যে জাতিব্যবস্থাকে বুঝতে গেলে জাতির উৎপত্তি, ক্ষমতা, তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে ধরা দেবে না। স্বতন্ত্রভাবেই এগুলিকে পর্যালোচনা করতে হবে।

জাতির উৎপত্তি ঃ জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে শাস্ত্রীয় মতামতই যথেষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিকদের দৃষ্টিভঙ্গিও পর্যালোচনা প্রয়োজন। জাতি কথাটি প্রথম ভারতীয় হিন্দু সমাজের স্তরবিন্যাস অনুধাবনের জন্য পর্তুগিজরা সর্বপ্রথম ব্যবহার করে। অধ্যাপক সেনার্ত মনে করেন ভারতীয় জাতিব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে কুল ও কুলদেবতার পূজার্চ্চনাকে ভিত্তি করে। রিসলে বলেন জাতিপ্রথার জন্ম হয়েছে অসম বর্ণসংঘাত থেকে। অধ্যাপক নেসফিল্ড বলেন বৃত্তি ভেদাভেদের মধ্য দিয়ে জাতির উৎপত্তি হয়েছে। প্রখ্যাত ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক ঘ্যুরে এরূপ উল্লেখ করেছেন যে, আর্যরা ভারতবর্ষে আগমনের পর রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার উদ্দেশ্যে জাতিব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে।

জাতির সংজ্ঞা ঃ 'জাতি' কথাটির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান একটি দুঃসাধ্য কাজ। অধ্যাপক ডি. এন. মজুমদার এবং অধ্যাপক টি. এন. মদন মনে করেন, জাতি হল একটি বদ্ধগোষ্ঠী। এটি একটি অন্তর্বৈবাহিক গোষ্ঠী এবং এর বংশানুক্রমিকতা আছে। অধ্যাপক শ্রীনিবাস মনে করেন জাতিপ্রথা হল এক সর্বভারতীয় ব্যবস্থা বিশেষ। কেননা জাতির অভ্যন্তরে সকলেরই স্থান জন্মসূত্রে নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে তিনি 'কর্মের ধারণা' এবং 'ধর্মের ধারণার' উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অধ্যাপক এস. সি. দ্যুবে মনে করেন, জাতি বিষয়ে যে কোন সরলীকৃত ব্যাখ্যাও যথেষ্ট জটিল মনে হতে পারে। কিন্তু এই জটিলতা এড়ানোর উপায় নেই। কারণ বাস্তব সমাজচিত্রটাও জটিল। ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী ও আচার-সংস্কারের সমাবেশ ঘটায় এর মধ্যে একটা সার্বিক ও সুসামঞ্জস্য কাঠামো খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবুও বলা যায় জাতিগত সংজ্ঞায় আঁদ্রে বেতেই অনেকখানি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন— জাতি হল একটি নির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত ক্ষুদ্রাকার জনগোষ্ঠী যার সদস্যগণ অন্তর্বিবাহ রীতি, বংশগত সদস্যপদ এবং একটি সুনির্দিষ্ট জীবনশৈলী অনুসরণ করে চলে, যেটি একটি নির্দিষ্ট পেশার সঙ্গে যুক্ত, ক্রমোচ্চ বিভাজিত এবং স্বতন্ত্র ধর্মীয় পদমর্যাদাভিত্তিক হয়। এর পশ্চাতে

জাতি ও বর্ণের পার্থক্য ঃ বর্ণ এবং জাতির আপাত পর্যালোচনায় উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়—এগুলি যথাযথ আলোচনার মধ্য দিয়ে বর্ণ এবং জাতির বৈশিষ্ট্যিক অবস্থান পরিচ্ছন্ন রূপ পাবে।

প্রথমত, বর্ণব্যবস্থা মানবসমাজ গঠনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হয়। কিন্তু জাতি ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে তার বহুকাল পর।

দ্বিতীয়ত, উৎপত্তিগত দিক থেকে বর্ণ প্রাচীন, তুলনায় জাতি নবীন।

তৃতীয়ত, অনেকে এরূপ মনে করেন যে, বর্ণব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিস্থিতিতে জাতি ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়। তাই জাতিব্যবস্থার মধ্যে বর্ণব্যবস্থার অনেক কিছুই অবস্থান করতে থাকে। বর্ণব্যবস্থা একাকী বহুকাল অবস্থান করলেও বর্ণকে বাদ দিয়ে জাতিব্যবস্থা অবস্থান করতে পারে না। সুতরাং বলা যায় বর্ণ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে জাতি সেই অর্থে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

চতুর্থত, জাতিব্যবস্থায় বর্ণের প্রাধান্য এত বেশি যে অনেকেই বর্ণ এবং জাতির অভ্যন্তরে পার্থক্য করতেও অপারগ।

পঞ্চমত, বর্ণভেদের কঠোরতা জাতিভেদের মত তীব্র নয়। এক বর্ণের সঙ্গে অন্য বর্ণের বৈবাহিক সম্পর্ক ঘটলেও এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির বিবাহ স্বীকৃত নয়। এই অর্থে জাতি অন্তর্বৈবাহিক।

ষষ্ঠত, বর্ণ মূলত বৃত্তি ও গুণবাচক, কিন্তু জাতি কেবলই বৃত্তিবাচক।

সপ্তমত, একটি বর্ণের অন্তর্ভুক্ত সদস্য তার গুণ ক্ষমতার বিচারে যেমন দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হতে পারত, আবার নিম্নগামীও হতে পারত। কিন্তু জাতিভেদ প্রথায় এই ধরনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। তবে জাতি নির্দেশিকা অমান্য করলে 'জাতিচ্যুত' হওয়ার সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুতরাং বর্ণ পরিবর্তনশীল, জাতি অপরিবর্তনীয়।

অষ্টমত, বর্ণ সংখ্যায় অল্প, কিন্তু জাতি অসংখ্য।

নবমত, বর্ণ বিভাজন অত্যন্ত সহজ সরল—চতুর্বর্ণ, এর কোন উপবিভাগ নেই। কিন্তু জাতিব্যবস্থা বহু ভাগ-উপভাগে বিভক্ত।

দশমত, বর্ণ জন্মভিত্তিক নয়, জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্ধারণ সম্ভবও নয়। কেননা কেউ তার কর্মগুণে এর পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কিন্তু জাতি জন্মভিত্তিক, তাই এটি বংশপরম্পরাগত এবং অপরিবর্তিত।

একাদশত, বর্ণের পর্যায়ক্রমিক অবস্থানে প্রভুত্বের সম্পর্ক থাকলেও পারস্পরিক সহাবস্থানও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু জাতিগত সহাবস্থান থাকলেও বর্ণের তুলনায় ততখানি উন্মুক্ত নয়।

দ্বাদশত, বর্ণভিত্তিক সমাজ অনেকখানি নিরাপদ ছিল, কিন্তু জাতিব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে অভিজাত্য, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ, জাতিভিত্তিক প্রতিযোগিতা, উগ্র জাতি-ভাবনা ইত্যাদি দেখা দিতে থাকে।

বাস্তবিক অর্থে বর্ণ এবং জাতির কোন স্বতন্ত্র সত্তা আজ আর বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া জাতি-বর্ণের পারস্পরিক বিবাদও নেই বললেই চলে। পারস্পরিক সহাবস্থানে একে অপরকে শক্তিশালী করেছে। তাছাড়া বর্ণব্যবস্থার বিবর্তিত রূপ হল জাতি যা বহু শতাব্দী ধরে ভারতীয় সমাজের এক অপরিবর্তিত বৈশিষ্ট্য হিসাবে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে কাজ করেছে। তাই বিবর্তিত সমাজের প্রেক্ষাপটে বর্ণব্যবস্থার তুলনায় জাতিব্যবস্থা সমাজ গবেষণায় অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে বলে কোন কোন সমাজতাত্ত্বিকের ধারণা। তবে যাই হোক না কেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত সাফল্যের ফলে বর্ণ এবং জাতি উভয়ই তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য হারাতে বসেছে। তবুও সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রশ্নে এই উভয় ব্যবস্থা যে আজও গুরুত্ব পায়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।